দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের সাথে প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের ঐক্যসূত্র - পূর্ণিয়ার বাংলা ও হিন্দী সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা - সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফনীশ্বর নাথ রেণু।

হিন্দী ভারতবর্ষের একটি বিরাট অঞ্চলের সাহিত্যভাষা। এর বিস্তার রাজস্থান পাঞ্জাবের পশ্চিম প্রান্ত থেকে বিহারের পূর্বপ্রান্ত এবং উত্তর প্রদেশের উত্তরসীমা থেকে মধ্য-প্রদেশের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত। এই সুবিশাল হিন্দীভাষী অঞ্চলের মধ্যে বিহারেই সর্বাপেক্ষা বেশী বাংলাসাহিত্য চর্চা হয়েছে। বিহার আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী রাজ্য। এই রাজ্যে হিন্দী ও বাংলার মধ্যে এক বিশেষ সাহিত্যিক বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল। এই সমন্বিত ধারার দুই ভিন্নভাষী কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফনীশ্বর নাথ রেণুর সৃজনক্রিয়ার তুলনাত্মক অধ্যয়নের পূর্বে পূর্বের অধ্যায়ে বাংলা ও হিন্দী উপন্যাসের যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে এই দুই কথাসাহিত্যিকের সৃজনক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য, বাংলা সাহিত্যের সাথে প্রতিবেশীরাজ্য বিহারের ঐক্যসূত্র এবং বিহারের একটি জেলা পূর্ণিয়া যা ঐ দুই লেখকের জন্মস্থল ও বিচরন ক্ষেত্র, সেই পূর্ণিয়ার সাহিত্য-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল।

" রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংলা ও বিহার আজ প্রতিবেশী রূপে পরিচিত হলেও বাংলা সাহিত্যের মানচিত্রে রাজ্যদুটির অবস্থান অনেকটা 'এক উঠোন দুই বাড়ি'র সমতুল্য।

কথাসাহিত্যের চলচিত্র নির্মাণে বিহারবাসী বাঙালী সাহিত্যিকরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতার মাটিকেই কাজে লাগিয়েছেন। সেই মৃত্তিকা সংলগ্ন বিহারবাসী মানুষজন সেই সুবাদেই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়। পরিণামে বিস্তৃত হয়েছে বাংলার মানসিক ভূখন্ড, বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে সেখানের মানুষের মিছিলে, শোভা সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভান্ডার।"[১]

বর্তমানে ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে বিহার ও বাংলা দুটি পৃথক রাজ্য। ১৯৯২ সাল থেকে বিহার স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয়েছে, এর পূর্বে একই প্রেসিডেন্সী অব বেঙ্গল এর মধ্যে বিহার ও বাংলার অবস্থান ছিল। এই দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে যাতায়াত ও পরস্পর আদান-প্রদানের আত্মীয়তাও গভীর। আধুনিক যুগে অর্থাৎ ইংরেজ ভারতে বাঙালীরা যে কয়েকটি প্রদেশে জীবিকার অন্বেষনে প্রায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করেছেন, বিহার তার মধ্যে অন্যতম।

ইংরেজ উপনিবেশ এদেশে কেবল প্রচলিত অর্থ রাজনীতিক-শাসন কাঠামো ভেঙে নতুন কাঠামোই প্রতিষ্ঠা করেনি, স্থাপন করেছিল এক সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞানতত্ত্ব, জ্ঞানদীপ্তি পর্য্যায়ের যুক্তি- বিজ্ঞানবাদ। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বাঙালিরা সর্বপ্রথম এই নতুন সভ্যতায় দীক্ষিত হয় এবং পরে তারাই বহন করে তার পতাকা ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশে। কোম্পাণীর শাসন কালেই বিহারে বাঙালিরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।। পুরুমানুক্রমে কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙালীরা সাঁওতাল পরগনা, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করে আসছিল। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বাঙালী সমাজ বিহারে শিক্ষিত সমাজ বলে গণ্য ছিল। বিহারে শিক্ষার বিস্তার তখনও ঘটেনি সুতরাং ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীরা বিহারে চাকরী ক্ষেত্রে এবং শিক্ষকতা, ওকালতি, চিকিৎসা প্রভৃতিতে প্রাধান্য অর্জন করেছিল। বিহার সেই সময় বাঙালিকে দেখেছে সিভিলাইজার হিসেবে। সম্প্রতি বিহারের এই বাঙালী সমাজকে নিয়ে অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ গবেষনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে লেখিকা শ্রীমতী সুদেষ্ণা বসাক (Socio-cultural study of a minority linguistic group : Sudeshna Basak, Delhi, B.R.Publs.1991) তবে এই গ্রন্থে লেখিকা 'বাঙালি' বলতে 'আলোকপ্রাপ্ত' সকল বাঙালিকে বোঝাননি, বুঝিয়েছেন মূলতঃ হিন্দু বাঙালির কথা এবং তার মধ্যে মুখ্য স্থান পেয়েছে উচ্চবর্ণের কৃতিত্ব ও ভূমিকা। বিস্মৃতির গহ্বর থেকে লেখিকা হাজির করেছেন সেই সময়কার বিহারের বাঙালি সমাজের অনেক খ্যাতকীর্তিদের যাঁরা আজ অনেকেই অশ্রুত বা অনামা।

প্রধানতঃ তিনটি কারণে বাঙালীরা বিহারে এসে বসবাস করেছেন। এক : বাঙালীরা সরকারী চাকরী নিয়ে অর্থাৎ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সরকারী কর্মচারী হিসেবে বিহারে

এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গ্রীশচন্দ্র মজুমদার, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামরতন মজুমদার, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। কেরকারী বা অর্ধসরকারী কাজে নিযুক্ত কিছু কিছু ব্যক্তিও বিহারে এসেছিলেন, এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজশেখর বসুর পিতা দ্বারভাঙ্গা-রাজের ম্যানেজার চন্দ্র শেখর বসু ও দেওঘর স্কুলের শিক্ষক যোগীন্দ্র নাথ বসু।

দ্বিতীয়ত : বিহারের স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, নদনদী পাহাড় উপত্যকার ও অত্যন্ত আকর্ষন ছিল। রাঁচি, গিরিডি, মধুপুর, দেওঘর, ভাগলপুর, প্রভৃতি মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থানগুলিতে অনেকেই স্বাস্থ্যোন্নতির আসায় এসে অস্থায়ীভাবে বাস করে গিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর রাঁচির মোরাবাদি পাহাড়ের উপর সুন্দর আবাসগৃহ ও উপাসনা মন্দির নির্মান করে সেখানেই তিনি তাঁর জীবনের শেষভাগ ধ্যান ও সাহিত্যচর্চায় অতিবাহিত করেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মুঙ্গের জেলার পীর পাহাড় অঞ্চলে এসে প্রায় থাকতেন এখানেই তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'মহিলাকাব্য' রচিত হয়। সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক রাজনারায়ন বসু ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে দেওঘরে আসেন এবং শেষ জীবন তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, তিনি তাঁর শেষ জীবন কর্মাটাঁড়ে অতিবাহিত করেন। এরকম বহু বিখ্যাত বাঙালী ব্যক্তিরাই অস্থায়ীভাবে বিহারে বাস করেছেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত বঙ্গবাসী বাঙালীর কাছে বিহার ছিল প্রকৃতি মার সারল্যের অপূর্ব মেলবন্ধন। 'পশ্চিম' কথাটির রোমান্টিক ব্যঞ্জনা মশা-ম্যালেরিয়া গ্রস্ত বাঙালিরা উপলব্ধি করেছিলেন তাই শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনের উপবন, যদুনাথ সরকারের 'আধ্যাত্মিক গৃহ', সঞ্জীব চন্দ্রের 'পালামৌ' বা সুখ স্মৃতির মধুপুর-শিমুলতলা তাই ক্রমশ: আমাদের গল্প-উপন্যাস, কাব্য ও প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

তৃতীয়ত : স্বাধীন জীবিকা নির্বাহ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং আত্মীয়তার সূত্রে অনেকেই এসে বিহারের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ ওকালতী, কেউ ডাক্তারী আবার কেউ স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করে স্বীয় প্রতিভাবলে প্রভূত ধনোপার্জন করে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন।

বাংলা দেশ হতে বহু দূরে বাস করেও এই সব বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই বিস্মৃত হন নাই যে জাতীয় জীবনের ঐক্য এবং গামঞ্জস্য বিধানের জন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক। প্রবাসে মাতৃভাষার সাধনা ও প্রচার যে তার আত্ম-রক্ষা ও আত্মপুষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় একথা উপলব্ধি করে প্রবাসী আপন সন্তানদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিহারে বহু শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা বাঙালীরা। এই শিক্ষায়তনগুলি পরবর্তীকালে মাধ্যমিক ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ঔপনিবেশিক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় যখন বিহার অঞ্চলের শিক্ষা পরিদর্শক ছিলেন তখন তিনি বিহারীদের মাতৃভাষা আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে বঙ্গদেশে ফারসীভাষার বদলে বাংলা ভাষার প্রবর্তনে হয়। তার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি হয়েছিল। ভূদেব বুঝেছিলেন বিহারে হিন্দীভাষা প্রচলিত হলে সেখানকার সাহিত্য ও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। বিহারবাসীরা ভূদেবের এই প্রয়াসকে অভিনন্দিত করে একাধিক গান রচনা করেছিলেন। পন্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস রচিত এরকম একটি গান উদ্ধৃত করা হল।[২]

"ধন্য ধন্য গবর্ণমেন্ট ।
জামনীকে দূর করি ।
'ভূবনদেব' করি পুকার।
পরজা দুখ দূর করহ ।
নানা বিধি ভাল হোত।
পরজা মন হরষ হোত ।
ধন্য বুদ্ধি ধন্য বিচার।
করি নেয়ার হিন্দ বীচ।
পরজা নিত সুযশ গায়।
জব লেঁ চন্দ্র সূর্য রহে।
প্রজা সুখ দায়ী
সাগরী চলাই ॥
লাট নিকট যাই।
জামনী দুরাই ॥
জামনী মেঁ রাই ।
বিদ্যা নিজ পাই ॥
ধন্য অন্তর ভাই।
হিন্দুই চলাই ॥
অম্বিকা মনাই।
রাজ রহে যাই ।"

হিন্দী পুস্তকাদি প্রনয়ন করে হিন্দীসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। যে সব পুস্তক বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট বলে পরিগনিত সে সব তিনি হিন্দী লেখকদের দিয়ে অনুবাদ করিয়েছিলেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ক্রমে ক্রমে বিহারের শিক্ষিত অধিবাসীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রবাসী বাঙালীদের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান-প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। বিহারে অনুষ্ঠিত একাধিক সাহিত্য সম্মেলনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিহারের হিন্দীভাষীদের মধ্যেও পড়েছে, গড়ে উঠেছে 'বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষৎ, পাটনা'(১৯৫১), 'বিহার হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন' পাটনা(১৯১৯) এর মত বিভিন্ন সংগঠন।

বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনে ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিহারবাসী বাঙালীদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্য চর্চার একটি বিশিষ্ট অংশ বিহারে হয়েছে। এই সাথে লক্ষনীয় সেখানে বাংলা ও হিন্দীর একটি মিশ্র সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বাতাবরণ সৃষ্টি, যা ভারতীয় সাহিত্যের অনিবার্য উপাদান বললে অত্যুক্তি হয় না। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে ভারতবর্ষে প্রথম সরকারি বাংলা আকাদেমি স্থাপন করা হয়েছে বিহারে ১৪ই মে ১৯৮৩ পাটনায়।

ভারতবর্ষে আন্তপ্রাদেশিক সাহিত্যিক লেনদেনের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কোন প্রাদেশিক সাহিত্যই যে কোনকালে কেবল প্রাদেশিক সাহিত্য নয় এ তথ্য ভুলে গিয়েই আমরা সাহিত্য পড়ি। শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সাহিত্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের যোগেই গঠিত। বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্মরণীয় আমৃত্যু বিহারবাসী সাহিত্যিক বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা। " নিরলস কর্মী বিভূতিভূষণ আজীবন বাংলা সাহিত্য প্রসারে নিজেকে ব্যাপৃত করেখেছিলেন। বিশেষতঃ বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রচেষ্টা সারাজীবন চালিয়ে গেছেন। বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের প্রতীক চিহ্নটি তাঁরই নির্ধারিত - মৈত্রীতে নিবদ্ধ দুটি হাত করমর্দনের ভঙ্গীতে। যার তাৎপর্য তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন 'সংহতি ও সমন্বয়'। বিভূতিভূষণের স্বপ্ন ভারত হবে অখন্ড, জাতিতে জাতিতে থাকবে না কোন ভেদাভেদ। দ্বারভাঙ্গায় বাঙালী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, পত্রিকাটির নাম দিয়েছিলেন 'অপ্রবাসী' অর্থাৎ ভারতবর্ষের কোন প্রান্তেই যে

কোন রাজ্যের লোক থাক না কেন সমগ্র ভারতই যখন একটা দেশ তখন প্রবাসী কেউই নন।"[৩] বিভূতিভূষনের এই 'প্রবাসী' সংজ্ঞাটি ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তাৎপর্যবহ।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে সমস্ত বাঙালী সাহিত্যিক বিহারে সাহিত্য -কীর্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখনীয় পাটনা বিভাগের বলদেব পালিত, পূর্নেন্দু নারায়ন সিংহ, যদুনাথ সরকার, যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার, মথুরানাথ সিংহ, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ছোটোনাগপুর বিভাগে প্রমথনাথ বসু, তিহুত বিভাগে চন্দ্র শেখর বসু, অনুরূপা দেবী, উপেন্দ্র নাথ সেন, ভাগলপুর বিভাগে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার, যোগীন্দ্র নাথ গুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ ভট্ট, ইন্দিরা(সুরূপা) দেবী, নিরুপমা দেবী। এঁরা সকলে অবিভক্ত বাংলার অন্তর্গত(১৯১২ খৃঃ) পূর্ব বিহারে বাস করে সাহিত্যচর্চা করেছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে নতুন বিহার প্রদেশ গঠনের পর যে সমস্ত বাঙালী সাহিত্যিক বিহারে অবস্থান করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখনীয় পাটনা বিভাগে বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য, নবেন্দু ঘোষ, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, রতীন হালদার। তিহুত বিভাগে জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ছোটনাগপুর বিভাগে মদনমোহন চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র রায়, ভাগলপুর বিভাগে কেদার নাথ বন্দোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, আশালতা সিংহ, প্রসাদ ভট্টাচার্য এবং সতীনাথ ভাদুড়ী।

বিহারে আরো কিছু প্রধান সাহিত্যিকদের নাম পাওয়া যায় যেমন - অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়(রাঁচি) অতুলচন্দ্র দত্ত(গয়া) অমলেন্দু গুপ্ত (দানাপুর) কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত (ভাগলপুর) প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (মজঃফরপুর) বংকিমচন্দ্র লাহিড়ী(আরারিয়া) জ্যোতিষ-চন্দ্র ভট্টাচার্য(পূর্ণিয়া) শচীন্দ্র লাল দাসবর্মা(গয়া) সুকুমার হালদার(রাঁচি) তারাপ্রসন্ন ঘোষ(রাঁচি) মনীন্দ্র নাথ সমাদ্দার(পাটনা) গিরীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়(ভাগলপুর) সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়(ভাগলপুর)।

এর বাইরেও বিহারে অনেক সাহিত্যসেবী আছেন, যাঁরা বিহারে থেকে নিয়মিত বাংলা সাহিত্য চর্চা করছেন। 'বিহারে বাংলা সাহিত্য(১৮৪১-১৯৪১)' বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ গবেষনা করেছেন নন্দদুলাল রায় বিহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিহারের বাঙালী সাহিত্যিক দের তথ্যসমৃদ্ধ এই গবেষনা সন্দর্ভটি বিহার বাংলা আকাডেমী পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেছেন। (বিহারে বাংলা সাহিত্য : নন্দদুলাল রায়। পাটনা, বিহার বাঙলা আকাডেমি, ১৯৮৯। উপরোক্ত লেখক তালিকাটি ঐ গ্রন্থসূত্রেই গৃহীত। বিহারের প্রধান লেখকদের তালিকা সন্তোষ মজুমদার কৃত। শ্রী মজুমদার 'বিহারের বাঙালী সাহিত্যিকদের পরিপ্রেক্ষিতে ঔপন্যাসিক ও গল্পকার সতীনাথ ভাদুড়ী' এ বিষয়ে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষনা করেছেন। এই গবেষনা পত্রটি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে (সতীনাথ জীবন ও সাহিত্য : ডঃ সন্তোষকুমার মজুমদার। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৩৯২) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও এবিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বিহার বাংলা আকাডেমী থেকে 'বিহারে বাঙালী' নামে গবেষনা গ্রন্থের কাজেও বেশ অগ্রগতি হয়েছে। বিহারের জীবনযাত্রা ও তার অগ্রগতিতে অতীতে এবং আধুনিক কালে বাঙালীদের ভূমিকার ইতিবৃত্ত সংকলন এই গবেষনার মুখ্য উদ্দেশ্য। আকাদেমী থেকে জানিয়েছে গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যগুলি একটি জীবনীমূলক অভিধানরূপ সংকলিত হবে। তার দুটি ভাগ হবে - একটিতে বাঙালী ব্যক্তি-সমূহের ও অন্যটিতে বাঙালীদের প্রতিষ্ঠানগুলির সমুখে তথ্য থাকবে। আকাডেমি থেকে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর দুটি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্য চর্চায় বিহারে বসবাসকারী বাঙালী সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী ছাপ রেখেছেন। এই বাঙালী সমাজ ও সাহিত্য সেবীদের সংযোগে বিহারে হিন্দীভাষীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরাও ক্রমশঃ নিজেদের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। বিহারে বাঙালীদের যেমন দ্বিতীয় মাতৃভাষা হিন্দী তেমনি বিহারের হিন্দীভাষী সাহিত্যসেবীরাও বাংলা ভাষা পড়তে ও বুঝতে পারতেন। এই দুই ভাষার পাশা-পাশি অবস্থানের ফলে, উভয় ভাষার সাহিত্যসেবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে বিহারের হিন্দী ও বাংলা ভাষার সমন্বয়ে মিশ্র সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। বিহারের

একটি জেলা পূর্ণিয়া একদা 'বিহারের বাংলা' বলে অভিহিত হত। আমরা সমগ্র বিহারকে আলোচনায় না এনে এই পূর্ণিয়া জেলাকে আনব। এই পূর্ণিয়া জেলা থেকে আমরা এমন দুজন ভারতীয় সাহিত্যিককে পাই যাঁরা ছিলেন হিন্দী ও বাংলার সাহিত্যের যোগাযোগের সেতু। এঁদের মধ্যে হিন্দী ও বাংলার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এঁদের একজন হলেন সতীনাথ ভাদুড়ী অপর জন ফণীশ্বর নাথ রেণু। এই দুই সাহিত্যিকের সৃজন ক্রিয়ার তুলনাত্মক অধ্যয়নই বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের মূল বিষয়বস্তু। সতীনাথের কাছে হিন্দী ও ফণীশ্বর নাথ রেণুর কাছে বাংলা ছিল দ্বিতীয় মাতৃভাষাস্বরূপ। সতীনাথের হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য পাঠের জগৎ যেমন একজন হিন্দীভাষী বিদগ্ধ পণ্ডিতের মত ছিল বিস্তৃত তেমনি ফণীশ্বর নাথের বাংলা সাহিত্য পাঠের জগৎ কৃত্তিবাসী রামায়ন থেকে অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকদের রচনা কর্ম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এঁরা দুজনেই পূর্ণিয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। দুজনের জীবনের অনেক সময় একসাথে কেটেছে এবং দুজনে 'গুরু-শিষ্য'র সম্পর্কের নৈকট্যে আবদ্ধ ছিলেন (পরবর্তী অধ্যায়ে সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেনুর জীবনী ও উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিস্তৃত আলোচনা করা হবে)।

পূর্ণিয়া জেলার উপর বাংলা ও বাঙালীর প্রভাব বললে ভুল হবে, বরঞ্চ কৃষ্টির ও ভৌগোলিক অবস্থানের একটি পরিষ্কার অংশ হচ্ছে পূর্ণিয়ায়। বিহারের অনেক অংশ কিছু-দিন আগেও বাংলারই অংশ ছিল, মানুষের সংস্কৃতি ও জীবনযাপনে। সতীনাথের জন্ম ১৯০৬ আর রেনুর ১৯২১, দুজনের মধ্যে বয়সের তফাৎ প্রায় পনেরো বছরের। বিভিন্ন ঘটনা ও সাহচর্যের সংযোগে সতীনাথের প্রভাব রেণুর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। রেণু নিজেও একথা স্বীকার করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণুর পারস্পরিক সম্পর্কের বিবরন শুধু আকর্ষণীয় নয়, হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কের দিক থেকেও গভীর তাৎপর্য-পূর্ণ। এই আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে পূর্ণিয়ার অধিবাসী দুই ভাষার সাহিত্যিকের আবাস ও বিচরন ক্ষেত্রের কিছুটা পরিচয় তুলে ধরছি।

উনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ণিয়া বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলা বিহারের কৃত্রিম বিভাগ তখনো হয়নি। ....."বাঙালীরা উত্তর বিহারে চাকুরীজীবি হইয়া আসিবার বহুপূর্বে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নৌকাপথে আসেন। তখনও এ অঞ্চলে রেলপথ

নির্মিত হয় নাই। ইহাঁরা স্থানে স্থানে যে সকল বৃহৎ অট্টালিকা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন নাথৌরা, ইটোয়া প্রভৃতিস্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নীলকুঠীর, ইটোয়া প্রভৃতিস্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নীলকুঠীর কর্মচারীরূপে এবং 'ওপিয়ম এজেন্টে'র অধীনে চাকুরী লইয়া বহু বাঙ্গালী বেতিয়া, মোতিহারী প্রভৃতি অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করেন।"[৪]

" পূর্ণিয়া শহরে বাঙ্গালী সমাজের পত্তন হয় তার থেকে এক শতাব্দী আগে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরাজ সরকারের চাকরিতে অফিসের কেরাণী (সে যুগে বাবু সম্বোধনে সম্মানিত), কোর্টের উকিল, মোক্তার, ডাক্তার হিসেবে তখন পূর্ণিয়ার বাঙ্গালী সমাজ গড়ে ওঠে। .....

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুগ অবসানে কুইন ভিক্টোরিয়ার হাতে যখন শাসন তার আগে তখন রামবাগ থেকে সদর কাছারি বর্তমান পূর্ণিয়া শহরের ভাটাবাজারের কাছে চলে আসে। এই পূর্ণিয়া কোর্টে, কিষনগঞ্জ ও আরারিয়া মহকুমা হাকিমের অফিসে চাকরি নিয়ে গড়ে ওঠে এই জেলার বাঙ্গালী সমাজ। .....

সেই সময় এই অঞ্চলে দুশোর বেশি নীলকর সাহেব পরিবার বসবাস করতো। দোর্দণ্ড প্রতাপ ইংরাজ শাসনের সে এক বিচিত্রযুগ। .....

কিন্তু এরই মাঝে বুদ্ধিজীবি বাঙ্গালীরা সম্মানের স্থান পেয়েছিল স্থানীয় জন-জীবনে। পূর্ণিয়া শহরে সেই সময়কার মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীদের মধ্যে কালিপ্রসন্ন সুর, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকা দে, ভুবন লাহিড়ী, পার্বতী সেন, কামাখ্যা-প্রসাদ ঘোষ, জানকী ভট্টাচার্য প্রভৃতি ছিলেন। ....."[৫]

সেই সময়ে বিহারের রক্ষণশীল সমাজ কখনোই বঙ্গবাহিত ইষ্ট সংস্কৃতিকে আপন মনে করেনি। পূর্ণিয়াতেও তার অন্যথা হয়নি। সম্ভ্রান্ত বিহারীরা চাকরী করা ভালো মনে করতেন না। তাই অধিকাংশ চাকরীতে বাঙালীরাই ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর অবস্থা

বদলায়। ইংরেজ শাসন ও বাঙালী উপশাসন দুই-ই ছিল বিহারীদের কাছে প্রায় একই রকম অসহ। এই কারণে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁদের আবেগ মথিত করেনি, বরং স্বতন্ত্র বিহারের দাবীতে সোচ্চার করেছিল। স্বাধীনতার পর শিক্ষিত বিহারীরা চাকরী শুরু করেন। জাতের বিচারে বাঙালীদের সঙ্গে বিহারী কায়স্থেরাও চাকরী করাটাই পছন্দ করতেন। রাজপুত ও ভূমিহাররা ছিলেন জমিদার ও বর্ধিষ্ণু কৃষক। গ্রামের অর্থনীতি ছিল রাজপুতদের হাতে। এদের বলা হোতো 'বাবুসাহেব'। এই অবস্থায় গ্রামে নিয়মিত মামলা মোকদ্দমা লেগেই থাকতো। গ্রামের সঙ্গে শহরের প্রধান সম্পর্ক ছিলো মামলা মকদ্দমার নালিশ উজুরের।

১৮০৭ সালে বুকানন তাঁর পূর্ণিয়া রিপোর্টে "it is one of the best country town's" বলে বর্ণনা করেছেন। পূর্নিয়ার জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল ছিল না বলে তখনকার দিনে কেউ কেউ পূর্ণিয়াকে কালাপানির দেশ হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। পূর্ণিয়ায় মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয় ১৮৬৪ খৃঃতে।

বঙ্গবাহিত সংস্কৃতি শুধু পূর্ণিয়া শহরে নয়, পূর্ণিয়ার গ্রাম সমাজেও ছিল। তবে সে সংস্কৃতি ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীর নয় আদি ও অকৃত্রিম সনাতন বাঙালী সমাজের। "আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত পূর্ণিয়া জেলার গ্রাম সমাজের সাধারন গৃহস্থেরা নিজের ঘরে বাংলা শিশুবোধ, কৃত্তিবাসী রামায়ন কাশীরামদাসী মহাভারত এবং বাংলা পঞ্জিকা রাখা অতি আবশ্যক মনে করতেন। পড়ুয়া ছেলেদের প্রশ্ন করা হত - 'বাংলা রামায়ন-মহাভারত পড়তে পারো ? ভগতাই গায়নে রাজা হরিশচন্দ্রের পালা গাইতে পারো ? প্রত্যেক গ্রামে একাধিক বারোয়ারি বা ব্যক্তি-গত খোল নিশ্চয় থাকত। খোলমানে সরাসরি নদীয়া থেকে আনানো শ্রী খোল। তাই ভাদ্র মাসের রাত্রে - শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর কয়দিন আগে থেকেই, অনেক রাত পর্যন্ত খোল-করতালের তালে তালে ভগতাই-গায়নের কলি গুলো বাতাসে ভেসে বেড়াত - 'তা রে না রে নদীয়া - নুহারে - নি-ত-নারে ..... বঙ্গমাতা সুরধুনি" .....।[৬]

O'Malley – তাঁর Purnea district Gazetteers –এ এই জেলার ভাষার বৈচিত্র্য, বাংলা ও হিন্দীর পাশাপাশি অবস্থানের চিত্র পরিষ্কার তুলে ধরেছেন – "At the census of 1901 the language of 1,773,000 persons, or 94.6 percent of the population, was returned as Hindi, and of 92,000 persons, or 4.9 per cent, as Bengali... Dr. Grierson, however, estimates the number of persons speaking Bengali to be 603,000 or nearly a third of the inhabitants. According to him, the dialect in question is, in the main, Bengali with an admixture of Hindi, but it is written in the Kaithi character of Bihar, in which Hindi and not Bengali is written. This fact doubtless weighed with the enumerators more than the niceties of grammatical construction; and, as a matter of fact, it is extremely difficult in many places to decide with which of the two languages the local dialect should be classed, for Bihari fades imperceptibly in to Bengali and Vice Versa."..... [৭]

বিহারে বাংলা ও হিন্দীর সমন্বয়ে মিশ্র ভাষার, বিহারের হিন্দী ও বাংলা উভয় সাহিত্যেই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। দুই বা অধিক ভাষার মিশ্রণ প্রক্রিয়া সচেতনে তত ঘটে না, যত ঘটে পারিবেশিক প্রভাবে স্বতোসারে ("People who live in the same community and amicably interact with one another, speak in a manner which greatly resembles one another's speech. This is indeed to be expected from the nature of the learning resources available to them. – M.W.Sugathapala De Silva, 'Diglossia and Literacy, CIIL, Mysore, 1976).

হয়ত সেই সময় দুই গোষ্ঠী বাঙালী ও বিহারী সমাজের মধ্যে আলাপচারিতার ব্যবহারিক কারণে হিন্দী ও বাংলা ভাষা মিশ্রণের দরকার ছিল। পঞ্চাশের পর থেকে এই মিশ্রণ তত সজীব আর নেই। খড়ীবোলি হিন্দীই বিহারের রাজ্যভাষা। সমাজে মান্য ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠায় হিন্দীলেখা নির্ভুলও পরিণত হয়েছে ক্রমশঃ। এখনকার গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী মিশ্র হিন্দী বলবে না, কিন্তু একটা বিশেষ সময়ের ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের চরিত্রগুলিকে যথাযথ করবার জন্য অনেক সাহিত্যিকই মিশ্র ভাষাটির সুকৌশল প্রয়োগ করেছেন। পূর্ণিয়ার অধিবাসী শ্রেষ্ঠ বাঙালী ও হিন্দী সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণুর রচনা কর্মেও এই মূল্যবান সাহিত্যিক কৌশলটি লক্ষণীয়।

সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণুর লেখক সত্তা ও লেখাকে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যই তৎকালীন পূর্ণিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল, এই সঙ্গে পূর্ণিয়ার তৎকালীন সাহিত্যিক ও সাহিত্যের বাতাবরনের কিছু কথা উল্লেখ করে আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করব।

পূর্ণিয়ায় বরাবর সাহিত্যের পরিবেশ ছিল। উপেন গঙ্গোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকেরা যেমন প্রথমদিকে পূর্ণিয়ায় অল্পকিছুদিন ওকালতি করতে আসেন, তেমনি বিবেকানন্দর অনুরাগী-শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ('স্বামী-শিষ্যসংবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা) পূর্ণিয়ার পোষ্টমাষ্টার হিসেবে অনেকদিন কাজ করেন। এছাড়া ভাগলপুরে থাকাকালীন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অল্পকিছুদিনের জন্য পূর্ণিয়ার _ বনৈলী এস্টেটে চাকরী করে যান। কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি বাংলা সাহিত্যে 'দাদামশায়' নামে খ্যাত, তাঁর শেষ জীবন বিহারের পূর্ণিয়া শহরে কেটেছে। ১৯০৬ সাল থেকে স্থায়ীভাবে পূর্ণিয়ায় অন্তিম দিন পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ ১৪ বৎসর কাটান। ১৯৫০ সালে ভট্টাবাজারে জামাই ডাক্তার হরিজীবন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান হয়। পূর্ণিয়ায় দাদামশায়ের বাড়ীর সাহিত্যের আড্ডা সম্পর্কে পূর্ণিয়া জেলার অধিবাসী আর এক সর্ববরেণ্য বাঙালী সাহিত্যিক বনফুল লিখেছেন - " বাংলা

সাহিত্য-সংসারের দাদামশাই সুখেন্দু সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে রোজ সন্ধ্যাবেলায় মজলিস বসত একটি। মজলিশে যোগ দিতেন যুবকেরা। বৃদ্ধ দাদামশাই বৃদ্ধদের সংসর্গ পরিহার করে চলতেন, তাঁর বন্ধু এবং বয়স্য ছিল তপরিনামদর্শী যুবকেরা। এই দলে থাকত দাদামশায়ের দৌহিত্র তিনজন। এরাও সাহিত্যরসিক। বংকিম, গেণু, আর একজনের নাম ঠিক মনে পড়ছে না। দাদামশাই পরিবেশন করতেন 'হিউমার' আর দিদিমা পরিবেশন করতেন নিখুঁত চা, সে চায়ের যেমন গন্ধ, তেমনি রং, তেমনি স্বাদ। এই মজলিশের সভ্য ছিল সতীনাথ।"[৮] এঁরাই ছিলেন সতীনাথের উত্তরসূরি। ফণীশ্বর নাথ রেণুকে যদি সতীনাথ ভাদুড়ীর উত্তরসূরী বলি, তবে তা অত্যুক্তি হয়না। পূর্ণিয়ায় এই দুই ভিন্ন ভাষার লেখক বড় হয়েছেন। একই ভূখণ্ডে, একই সমাজ মানুষজন, রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। দুজনের জীবন ও সাহিত্যই পূর্ণিয়া কেন্দ্রিক। হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যে এমন দ্বিতীয় নজির আর নেই। সতীনাথ ও রেণু অনুরাগী পূর্ণিয়ার প্রাক্তন অধিবাসী সুবল গঙ্গোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন - " সতীনাথের জন্ম ১৯০৬ আর রেণুর ১৯২১। অর্থাৎ দুজনের মধ্যে বয়সের তফাৎ ছিল পনরো বছরের। কিন্তু বয়সের তফাৎ পূর্ণিয়ার পরিবেশে তখন কোনো বাঁধা ছিলো না। কেননা বয়সে প্রায় তিরিশ বছর ছোটো হওয়া সত্ত্বেও সতুদাই ছিলেন আমাদের বয়সেরও আদর্শ। ফলে পূর্ণিয়া স্কুলের আরেকজন সাহিত্যিক সে যে কোনো ভাষারই হোক না কেন সতুদার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।"[৯]

পূর্ণিয়ায় বাংলা ও হিন্দীসাহিত্যের আত্মীয়তায়, ভারতীয় কথা সাহিত্যের যে জগৎ তৈরী হয়েছিল তার শ্রেষ্ঠ দুই শিল্পী হলেন সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণু।

উল্লেখপঞ্জী

১। প্রবাসী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : মঞ্জুলী ঘোষ, সম্পাদক। কলকাতা পুস্তক বিপনি, ১৩৯৬। পৃ: ২৯

২। বিহারে বাংলা সাহিত্য (১৮৪১ - ১৯৪১) নন্দদুলাল রায় । পাটনা, বিহার বাংলা আকাডেমি, ১৯৮৯ পৃ: ১৫

৩। প্রবাসী বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় : মঞ্জুলী ঘোষ, সম্পাদক। কলকাতা পুস্তক বিপনি, ১৩৯৬। পৃ : ১৩২

৪। বিহারে বাংলা সাহিত্য (১৮৪১-১৯৪১) : নন্দদুলাল রায়। পাটনা, বিহার বাঙলা আকাডেমি, ১৯৮৯। পৃ : ১০

৫। সতীনাথ স্মরণে : সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদক। পাটনা, ভারতীভবন, ১৯৭২ । পৃ : ১ - ২

৬। সতীনাথ স্মরণে : সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদক। পাটনা, ভারতীভবন, ১৯৭২। পৃ : ২০

৭। Bengal District Gazetteers : Purnea : L.SSO' Malley. Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1911. p.57

৮। সতীনাথ স্মরণে : সুবল গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদক। পাটনা, ভারতীভবন, ১৯৭২। পৃ : ১৮

৯। কৃত্তিবাস (ফণীশ্বর রেণু সংখ্যা) সমীর রায় চৌধুরী, সম্পাদক। কলকাতা, আষাঢ়-শ্রাবন, ১৩৮৪। পৃ : ১০৯৮ - ১১০০